অবিকল সাদৃশ্যও উপলক্ষিত হয়।' (প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ধম্মপদ পরিচয়', পৃ. ১৭)। এ কারণেই হয়তো রবীন্দ্রদর্শন উপনিষদ্ ভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের কথা "আত্মপরিচয়" শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক রচনায় বলেছেন, 'তা শুধু এই জন্মের নয় তা বহু জন্মের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত।' এই কবিজীবন তাঁর জীবনদেবতা দ্বারা রচিত এবং তিনি বলেন, '.........অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।' (র-র ১০, পৃ. ১৭০)।

শিশিরকুমার দাশ মনে করেন রবীন্দ্রনাথের 'এই বোধ হিন্দু-বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদের সঙ্গে জড়িত......।' (শিশিরকুমার দাশ, 'আত্মজীবনী : জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ২২)।

বুদ্ধের মৌলিক সিদ্ধান্ত হল যে জগৎ দুঃখময় এবং দুঃখের বিনাশ কাম্য। রবীন্দ্রদর্শনেও দুঃখ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দুঃখের বিনাশ চাননি, কারণ দুঃখের মধ্য দিয়ে গিয়েই মানুষের আত্মশুদ্ধি ঘটে। তাই দুঃখকে পরিহার করা নয়, দুঃখ বরণীয়, দুঃখই পারে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বোধ জাগ্রত করতে।

'সাধনা' গ্রন্থের অন্যত্র তিনি প্রেমের ভিতর দিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করার কথা বলেছেন, যার পিছনেও রয়েছে বুদ্ধের মৈত্রীভাবনা বা মেত্তিভাবনা। প্রেমের ভিতর দিয়ে অসীমকে লাভ করা সম্ভব কারণ প্রেম সকলের ঊর্ধ্বে। আত্মা ক্রমান্বয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন তার মধ্যে প্রেমের ভাব জাগে। বুদ্ধ আত্মার এই অবস্থায় পৌঁছোনোর সাধন বলে দিয়েছেন — তা হচ্ছে শীল গ্রহণ ও শীল সাধনা।[৮] শীল সাধনার দ্বারা মৈত্রীকে অবাধে বিস্তার করা যায়। মানুষ যখন তার অপরিমিত মিত্রতা ও সম্প্রীতির দ্বারা নিজেকে বিশ্বলোকে অভিব্যক্ত করে তা হয় তার ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মবিহার বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে ব্রহ্মের '......মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম' ("বুদ্ধদেব", র-র ১১, পৃ. ৪৭৭) মেশাতে হবে অর্থাৎ ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হবে।

Scanned with CamScanner

উপনিষদের পথ ধরে রবীন্দ্রনাথ 'ভূমাকেই, সকলের চেয়ে বড়োকেই' জানতে চান, ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রেই মিলিত হওয়ার কথা বলেন। "ধর্মের সরল আদর্শ" প্রবন্ধে তিনি বলেন, '......ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা।' (র-র ১২, পৃ. ২৩)। সাধনা ব্যতীত মিলন হওয়া অসম্ভব এবং বুদ্ধ যেমন নির্দিষ্ট সাধনার পথের কথা বলেন রবীন্দ্রনাথ তেমনই বলতে চান।

মানুষের সংযমী চরিত্রগঠনের উপর রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তার জন্য বুদ্ধের বাসনাবর্জনের শিক্ষাও তিনি নিয়েছেন। মানুষের চরিত্রে অসংযমের পাল্লা ভারী হলে চরিত্র তার সামঞ্জস্য হারায়। জীবনে বহু প্রলোভন আসে, নানা বাসনা জাগে, সে সকল বাসনা পূর্ণ করার জন্য মানুষ অসংযমী হয়ে ওঠে। চিত্তের প্রসারণ ঘটাতে পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে মানুষের বাসনা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই ঈশ্বর তাকে বঞ্চনা করে তাঁর সঙ্গে তার মিলন সম্ভব করেন। মানুষ তাই বলে, 'আমি বহু বাসনায় প্রাণপনে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।' (পৃ. ৯৯)

রবীন্দ্রদর্শনে মানবকেন্দ্রিকতাও বৌদ্ধধর্ম থেকে গৃহীত। বৈদিকযুগে স্বর্গবাসী দেবতাদের পরম দয়ার উপরেই মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য নির্ভর করতে হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মই প্রথম কোনো মানুষকে মানুষের মধ্যে অনেক বড়ো করে দেখেছিল, মানুষের কর্মই মানুষকে দেবতার পদে উন্নীত করেছিল, সত্য মানবরূপ ধারণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথও মানবদেবতাকে মানুষের মধ্যে দেখেছিলেন। "মানবসত্য" প্রবন্ধে তিনি বলেন,

> ....আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা।
>
> (সংযোজন, 'মানুষের ধর্ম', র-র ১২, পৃ. ৬১২-১৩)।

বুদ্ধের উপদেশ ছিল, 'মা যেমন আপন আয়ু ক্ষয় করেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাবে।' ('মানুষের ধর্ম', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৯)। তিনি মানুষের অপরিমিত প্রেমের কথা

Scanned with CamScanner

বলেছিলেন যা তার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যে মানুষের অন্তরের যে সোহ্হং বোধ তাকে সার্থক করে তুলবার জন্যই মানুষ হয়ে জন্মানো। সোহ্হংতত্ত্ব বলতে বোঝায় সকল মানুষের প্রতি প্রেম প্রীতি যার পরিণামে মানুষ তার অহংবোধকে ছাড়িয়ে গিয়ে পরমমানবের সঙ্গে মিলিত হয়।

বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দর্শনটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চণ্ডালিকা' গীতিনাট্যে ব্যক্ত করেছেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আনন্দ চণ্ডালিনী প্রকৃতির কাছে তৃষ্ণার্ত হয়ে জল প্রার্থনা করলে প্রকৃতি তাঁকে জল দান করতে অসম্মত হয়ে জানায়,

ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো মোরে —
আমি চণ্ডালের কন্যা,
মোর কূপের বারি অশুচি।
আমি চণ্ডালের কন্যা।

(পৃ. ৭১৩)

এরপরে আনন্দ যা বলেন তা রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে তাঁর চিন্তায় গ্রহণ করেছিলেন —

যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা।
সেই বারি তীর্থবারি যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে.......

(পৃ. ৭১৪)

খুব বিস্তৃতভাবে না হলেও এই আলোচনা থেকেই রবীন্দ্রনাথের উপর বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

পূর্বোক্ত আলোচনার সূত্র ধরে উপনিষদ্ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে কী বলেন সেই আলোচনায় ফিরে আসি। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেন ব্রহ্ম সকল বস্তুর দীপ্তি, এবং প্রাণ, তিনি বিশ্বচেতনাময়। এই বিশ্বচেতনাকে লাভ করতে হলে মানুষের সংবেদনশীলতাকে পরিব্যাপ্ত করতে হবে অসীম অনুভূতিময়তার সঙ্গে। বাস্তবে মানুষের সত্যকার প্রগতি তার সম্প্রসারিত অনুভূতির অনুরূপ। তা আমাদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ধর্মচর্চা চেতনার পরিধি বর্ধিত করতে

Scanned with CamScanner

সাহায্য করে। মানুষ কতখানি সত্য তার মান নির্ধারণ করা যায় তার চেতনার পরিধির পরিমাপে। চেতনার মুক্তিলাভ বা প্রসারণ কীভাবে অর্জন করা যায় তা জানাতে রবীন্দ্রনাথ বলেন আমাদের এর জন্য মূল্য দিতে হবে। এর মূল্য কী? এর জন্য নিজেকে ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগের দ্বারা আত্মা নিজেকে সত্যভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

গীতায় ফললাভের আশা না করে নিষ্কাম কর্ম করার যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এমন কথা বলা যায় না যে জগৎ মিথ্যা তাই মানুষ নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করে। ঠিক এর বিপরীতই ঘটে। মানুষ যখন নিজের শক্তি, সম্পদ, সম্মান ইত্যাদির বৃদ্ধি চায় তখন তার কাছে সমস্ত পৃথিবী মিথ্যা হয়ে যায় — 'বাসনা যখন বিপুল ধুলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়.........' (পৃ. ৪৪) মানুষের বাসনা তার চেতনার অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে এবং এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে মানুষকে সকল কিছুর প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সচেতন হয়ে তার নিজস্ব কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হতে হয়। এভাবে কিছু সামাজিক কর্তব্য পালন করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পথের সঞ্চয়' লেখাটিতে টাইটানিক জাহাজ ডোবার পূর্ব মুহূর্তের কথা বলেছেন। ইউরোপীয়রা জাহাজ ডোবার সময় যেভাবে মহিলা ও শিশুদের রক্ষা করেছেন — এই জাতীয় অবশ্য-কর্তব্য-বোধ হঠাৎ জেগে ওঠা কোনো বোধ নয়, এর জন্য দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, '.......এই বীরত্ব আকস্মিক নয়, ব্যক্তিগত নয়; সমস্ত জাতির বহুদিনের তপস্যার সহিত আধ্যাত্মিক শক্তি ভীষণ পরীক্ষায় মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করিল।' (র-র ১০, পৃ. ৮৬৫)। বহুর সঙ্গে মিলনে চেতনার সম্প্রসারণ মানব সম্প্রদায়ের এক ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

ভারতীয় ঋষিরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে অসীমকে এ জীবনে জানতে পারাই হচ্ছে সত্য; আর তা না পারাই মৃত্যুর নিঃসঙ্গতা বয়ে আনে। তাঁকে সকল কিছুতে উপলব্ধি করার অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র প্রকৃতিতেই নয়, বিশ্বচেতনাকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে উপলব্ধি করাই মানুষের পক্ষে কল্যাণকর।[৯]

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যাশা যে তাদের পক্ষে ঈশ্বরলাভ সম্ভব কারণ অতীতকালের কবি-সাধকেরা আত্মার আত্মীয়রূপে সমগ্র জগতের

Scanned with CamScanner

পরিচয় পেয়েছেন। এ মানুষের কোনো কল্পনা নয়। মানুষের ভূমিকাকে প্রকৃতির মধ্যে এভাবে দেখা তাকে অতিরঞ্জিত করে দেখা নয়, এখানে সে তার সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে গিয়ে আরও অতিরিক্ত কিছু হয়ে উঠেছে। এই সত্যদ্রষ্টারা চিত্তের গভীরে অনুভব করেছেন যে পৃথিবীর বাহ্যরূপের মধ্য দিয়ে যে প্রাণশক্তি প্রবাহিত হয় তা আমাদের আন্তরচেতনারূপে প্রকাশিত হয় এবং এই সংযোগের মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই। এমনকী মৃত্যুও কোনো ছেদ আনে না। তাই মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করে কবি-সাধকেরা কাব্যে বলতে পারেন —

মৃত্যু যে আমার অন্তরঙ্গ,
জড়িয়ে আছে আমার দেহের সকল তন্তু।
তার ছন্দ আমার হৃৎস্পন্দনে,
আমার রক্তে তার আনন্দের প্রবাহ।
বলছে সে,— চলো চলো,
চলো বোঝা ফেলতে ফেলতে,
চলো মরতে মরতে নিমেষে নিমেষে
আমারি টানে, আমারি বেগে।

("শেষ সপ্তক" উনচল্লিশ, র-র ৩, পৃ.২০৪)

এই সত্যদর্শীরা জন্ম ও মৃত্যুকে অবিচ্ছিন্ন করে দেখেন এবং জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে অন্তরঙ্গতা লক্ষ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতে তা এইভাবে প্রকাশ করেন—

'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই —
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।।'

(পৃ. ২৩৪)

আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে চেতনার সর্বোচ্চ মুক্তির আদর্শ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি। চেতনার এই চরম পরিণতির ধারণা কোনো জ্ঞান বা আবেগজনিত নয়, এর নীতিবিষয়ক ভিত্তি আছে যা কর্মে পরিণত করতে হয়। উপনিষদে বলা হয় পরমপুরুষ সর্বব্যাপী যিনি সকলের মধ্যে সহজাত

Scanned with CamScanner

মঙ্গলের বোধ জাগিয়ে তোলেন। মঙ্গল তার তাৎপর্য খুঁজে পায় যখন মানুষ জ্ঞানে, প্রেমে, এবং সেবায় সর্বসত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে অনুভব করে। উপনিষদের শিক্ষার এই হচ্ছে প্রধান বক্তব্য।

তথ্যসূত্র

১. এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালের ইংরেজ কবিদের কথা বলেছেন যাঁদের দৃষ্টিতে প্রকৃতি অন্যভাবে ধরা দিয়েছে।

"We observe a sudden and a completely different attitude of mind in the later English poets, like Wordsworth and Shelley, which can only be attributed ti the great mental change in Europe.......through the influence of the newly-discovered phi losophy of India.........".

(Ibid., p. 397.)

"The Message of the Forest" প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ব্যাঙ্গালোরে Festival of Fine Arts -এ উদ্বোধনী ভাষণ হিসাবে পাঠ করেন (১২ জানুয়ারি ১৯১৯)। এটি বাংলা প্রবন্ধ "তপোবন" ('শান্তিনিকেতন' বক্তৃতামালা)-কে ভিত্তি করে রচিত হয় যা পরে The Modern Review (মে ১৯১৯)-এ মুদ্রিত হয়। পরিবর্তিত আকারে পরে *'Creative Unity'* গ্রন্থটিতে "The Religion of the Forest" নামে সংকলিত হয়।

২. 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'ঝুলন' ১৫ চৈত্র ১২৯৯। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লেখেন, রাজশাহিতে রবীন্দ্রনাথ বন্ধু লোকেন পালিতের সঙ্গে সাহিত্য ছন্দ দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেন, যেখানে তাঁদের, '.......লঘুগুরু সকল ভাবেরই কথা কাটাকাটি চলে। কবির চিত্তকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার অসাধারণ শক্তি ছিল লোকেনের। এই সব আলাপ-আলোচনার ঘাতপ্রতিঘাতে' 'ঝুলন' কবিতাটি রচিত হয়, ('রবীন্দ্রজীবনী'১, পৃ. ৩৬৮)

৩. "Can Science Be Humanized?" in 'Lectures And Addresses' compiled in *EWRT*, Vol. III, p. 665. Published in Visva-Bharati News, vol. 2, No. 2, August 1933, p. 11.

৪. 'Personality' (1917) গ্রন্থটিতে ছ'টি ভাষণ সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার আমেরিকা সফরের সময় (সেপ্টেম্বর ১৯১৬ থেকে জানুয়ারি ১৯১৭) এগুলি রচনা করেন।

৫. ঋগ্বেদের শাকল শাখায় দশটি মণ্ডল আছে এবং দশম মণ্ডলে দার্শনিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেখানে 'পুরুষ সূক্ত'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সমগ্র সৃষ্টিকে একই বিরাট পুরুষের অঙ্গ বলে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি এত বিরাট যে সমগ্র পৃথিবীকে ব্যাপ্ত

Scanned with CamScanner

পাপবোধ

রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে সৃষ্টিতে অশুভ বা অসম্পূর্ণতার ব্যাখ্যা করেছেন। সৃষ্টিতে অসম্পূর্ণতাই বা কেন অথবা অমঙ্গল ও অশুভই বা কেন স্থান পেয়েছে, এ দুটি প্রশ্নই এক। বা এমন প্রশ্নও আমরা করতে পারি যে সৃষ্টির প্রয়োজনই বা কোথায়, কিন্তু এই প্রশ্নও অবান্তর। সৃষ্টি এবং অসম্পূর্ণতা কোনোটারই ব্যত্যয় হওয়া সম্ভব ছিল না; সৃষ্টিকে অসম্পূর্ণ ও পর্যায়ক্রমী হতেই হবে, এবং এ প্রশ্ন করাও নিরর্থক যে আমাদের অস্তিত্বেরই বা দরকার কী?

যে যথার্থ প্রশ্ন আমাদের করা উচিত, তা হচ্ছে এই অসম্পূর্ণতা কি চূড়ান্ত সত্য, পাপ কি অপ্রতিহত ও চরম? নদীর সীমারেখা ও পাড় রয়েছে কিন্তু নদী বলতে কি শুধু তার পাড়ই বোঝায় বা পাড়-ই কি নদীর শেষ কথা? নদীর জল বাধাপ্রাপ্ত হয়েই সম্মুখগামী হয়। নৌকাকে কাছি দিয়ে বাঁধা হয়, কিন্তু বন্ধনই কি তার অর্থ? একই সঙ্গে সে কি নৌকাকে সম্মুখে টেনে নেয় না? পৃথিবীর ঘূর্ণনের যে গতি তার সীমা রয়েছে তা না হলে পৃথিবীর অস্তিত্বই থাকত না কিন্তু তার উদ্দেশ্য তার সীমার মধ্যে নয়, যা তাকে নিয়ন্ত্রিত করছে, তা রয়েছে তার গতিময়তায় যা তাকে পূর্ণতার অভিমুখে নিয়ে যায়। পৃথিবীতে প্রতিবন্ধকতা বা দুঃখকষ্ট যে থাকবে তা বিস্ময়কর কিছু নয়, কিন্তু এটাই আশ্চর্যের কথা যে একই সঙ্গে আছে নিয়ম ও শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য ও আনন্দ, মঙ্গল ও প্রেম। মানবসত্তায় যে ঈশ্বর সম্বন্ধে বোধ রয়েছে তা বিস্ময় উৎপাদন করে। মানুষ তার জীবনের গভীরে অনুভব করেছে যে অসম্পূর্ণতাই পূর্ণের অভিব্যক্তি। মানুষ এই বিরাট কূটাভাসের সন্ধান পেয়েছে, সে জেনেছে যে যা-কিছুই সসীম তা তার সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, তার চলমানতা অনন্ত। মানুষ প্রতিমুহূর্তে তার সীমাকে লঙ্ঘন করে চলেছে। সীমা ও অসীম পরস্পরবিরোধী নয়, বা অসম্পূর্ণতা পূর্ণতার নেতিবাচক দিক নয়। এ সকলই অংশের মধ্যে পূর্ণতার বিকাশ, সীমার মধ্যে অসীমের উন্মোচন। সীমা তার নিজস্ব জায়গায় থেমে থাকে না, সে অসীমের দিকে এগিয়ে চলে। মানুষের চিন্তা বা অনুভূতি যদি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে তা হলে আবেষ্টনের (closure) সৃষ্টি হবে। অসীমকে লাভ করবার কোনো উপায় আর থাকবে না। তাই সীমার গতি অসীমের

Scanned with CamScanner

আমরা প্রতিদিন জীবনে নানা ধরনের দুঃখ যাতনা ভোগ করি যার মূলে রয়েছে আমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান, অলভ্য শক্তি ও ইচ্ছাপ্রয়োগে ব্যর্থতা। কিন্তু এ ঘটনাগুলি শুধুমাত্র দুর্বলতা প্রকাশ না করে বিমল আদর্শের সন্ধান দেয়। এই আদর্শ আমাদের বর্তমান সীমাবদ্ধতার বাইরে নিয়ে যায়। অন্তরে আমাদের অসীমের প্রতি যে চিরন্তন বিশ্বাস সে বিশ্বাস আমাদের অক্ষমতাকে স্থায়ীরূপ দেয় না; আপন পরিধিকে কোনো সীমায় বেঁধে দেয় না; ঈশ্বর ও মানুষের অভিন্নতাকে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে এবং জীবনের নানা অবাস্তব স্বপ্ন প্রতিদিন সত্য হয়ে ওঠে।

আমাদের মনকে যখন আমরা অসীমের উদ্দেশে চালনা করি তখনই আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করি। সত্যের আদর্শ কখনোই বর্তমানের গণ্ডিতে বাঁধা নয়, তা তাৎক্ষণিক আবেগের মধ্যেও নেই, তা আছে সেই পূর্ণের চেতনায়। পূর্ণের চেতনা থেকে আমাদের উপলব্ধি জাগে, আমাদের মধ্যে কী আছে এবং কী থাকা উচিত তা উপলব্ধি করি। চেতনে বা অচেতনে আমরা নিজেদের জীবনে যে সত্যকে অনুভব করি তা তার বাহ্যরূপের চেয়ে বৃহৎ, কারণ জীবন গতিশীল এবং অসীমের অভিমুখী। জীবন যখন প্রার্থিত বস্তুকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে সেই লক্ষ্যকেও সে অতিক্রম করে যায়। অধর্ম বা পাপ জীবনের গতিপথ রুদ্ধ করে না, যা-কিছু পাপ তা ক্রমাগত অগ্রসর হয়, তাকে মঙ্গলে পরিণত হতে হয়, তার গতি স্তব্ধ করে সে সমগ্রের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারে না।

পাপ কী রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে সে বিষয়ে বলেছেন, '........মানুষের আর একটা দিক যেটা তার আন্তরিক তার আত্মিক— সেইখানে তার পাপ পুণ্য। সেই সব রিপুকেই আমরা পাপ বলি যাতে করে বিশ্বাত্মার সঙ্গে আমাদের জীবাত্মার সম্বন্ধ বিকৃত হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুর দ্বারা আমরা নিজের অহংসীমার মধ্যে বদ্ধ হই।' ('চিঠিপত্র' ৯, পৃ. ১১৯, ৮ নভেম্বর ১৯৩১)।

পৃথিবীর কিছু মানুষ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে তাদের কাছে অস্তিত্বই পরম পাপ যদিও তাদের এই কথাকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে পারি না।[৩] তাদের নৈরাশ্যবাদ নেহাতই একটি দৃষ্টিভঙ্গি তা সে প্রজ্ঞাজনিত হোক বা ভাবপ্রবণতাই হোক, কিন্তু জীবন আশাবাদী তাই সে এগিয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন

Scanned with CamScanner

নৈরাশ্য এক ধরনের মানসিক মাদকতা। 'সাধনা'-র তৃতীয় পরিচ্ছেদে অমঙ্গলের সমস্যা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দুঃখকে কখনোই অপ্রতিহত এবং চরম বলে মানেননি। মানুষের জীবনে দুঃখও যেমন আছে অসম্পূর্ণতাও তেমন আছে না হলে সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন থাকত না। অসম্পূর্ণতার অর্থ কখনোই সম্পূর্ণতার নেতিবাচক দিক নয়, সীমা ও অসীম পরস্পরবিরোধী নয়; এ সবই সম্পূর্ণতাকে খণ্ডে প্রকাশিত করে অসীমকে সীমার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত করে। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে হতাশাও কখনো স্থায়ী হতে পারে না। মানুষ যখন গভীর নিরাশায় ডুবে যায় তার ক্রিয়াশীলতা থেমে যায়, ফলে তার চেতনার সম্প্রসারণ ঘটে না, তার আত্মবোধ হয় না। জীবনে হতাশা বা নৈরাশ্য আসতে পারে কিন্তু তার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকলে জীবন হয়ে পড়ে নিশ্চল ও বিকাশহীন। মানুষকে তার মহত্তর জীবন লাভ করার উদ্দেশ্যে নিরাশা কাটিয়ে ফেলে কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে, যে কর্ম তাকে তার আপন পূর্ণতার আদর্শকে পেতে সাহায্য করবে। কবি সংগীতে তাই বলেন,

ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে,
নিমেষের কুশাঙ্কুর পড়ে রবে নীচে।।
কী হল না, কী পেলে না, কে তব শোধে নি দেনা
সে সকলই মরীচিকা মিলাইবে পিছে।।

(পৃ. ১৩৮-৩৯)

মানুষের চলিষ্ণু জীবনই কাম্য, যে অবস্থাতেই সে থাকুক সেভাবেই তার জীবন যেন না কাটে। যে-কোনো ধরনের মত্ততাজনক অবস্থায় তার সংবেদনশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। এ তো তার অভিপ্রায় নয় তাই এ আক্ষেপ হতেই পারে—

কেন জাগে না, জাগে না অবশ পরান —
নিশিদিন অচেতন ধূলিশয়ান?

(পৃ. ১৬৫)

অস্তিত্ব যদি সত্যই অমঙ্গলজনক হত তা হলে তা কোনো দার্শনিকের প্রমাণ দেওয়ার অপেক্ষায় থাকত না। অস্তিত্বই এখানে প্রমাণ করতে পারে যে তা অমঙ্গলজনক।

Scanned with CamScanner

তেমনই কোনো কিছুতে ত্রুটি থাকার অর্থ এই নয় যে তা সম্পূর্ণভাবেই ত্রুটিপূর্ণ, উৎকর্ষ অর্জন করা হচ্ছে যার আদর্শ তাকে ক্রমাগত উপলব্ধির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আমাদের বিচারশক্তির কর্মও তাই সত্যকে অসত্যের ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করা এবং জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রেও তাই ভ্রমকে ক্রমাগত দগ্ধ করে সত্যকে মুক্ত করতে হয়। আমাদের এষণা (will) ও আমাদের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ অর্জন করতে অবিরত অন্তরে এবং বাইরে অথবা যুগপৎ দুটি ক্ষেত্রেই অমঙ্গলকে অতিক্রম করতে হয়। যেমন মানুষের শারীরিক জীবনকে টিকিয়ে রাখতে জৈবিক উপাদানকে নিঃশেষ করতে হয় তেমনই তার নৈতিক জীবনও দহন করে পেতে হয়।

আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।

(পৃ. ৯৮)

জীবনের গতিমুখ এভাবেই চলে এবং আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় যে মনুষ্যত্বের গতিপথ অমঙ্গল থেকে মঙ্গলের দিকেই এগিয়ে চলেছে। কারণ আমরা অনুভব করি যে মঙ্গল হচ্ছে মানবপ্রকৃতির ইতিবাচক দিক এবং মঙ্গলের আদর্শকে মানুষ সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে থাকে। বুদ্ধ যিশু বা চৈতন্য তাই আমাদের পূজ্য, এঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে মঙ্গল কী তা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

খুব স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে, মঙ্গল কী? বা আমাদের নৈতিক চরিত্র বলতে কী বোঝায়? এর উত্তর 'সাধনা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছেন : মানুষ যখন তার সম্প্রসারিত দৃষ্টিতে তার প্রকৃত আপনাকে দেখে তখন সে উপলব্ধি করে যে বর্তমানে সে নিজেকে যেভাবে জানে তার চেয়ে সে অনেক বেশি কিছু। তার মধ্যে আরও বেশি কিছু হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই সে তার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন হতে থাকে। সে উপলব্ধি করে সে এখনো কী হয়ে ওঠেনি। তার বর্তমান অভিজ্ঞতার তুলনায় তার অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা আরও সত্য হয়ে ওঠে। আবশ্যিকভাবে তার জীবনের প্রেক্ষিত বদলে যায়; তার এষণা তার ঈপ্সা (wish)-র স্থান অধিকার করে। এষণা হল জীবনের

Scanned with CamScanner

অন্তিম ইচ্ছা, যে জীবনের বহুলাংশই বর্তমানে রয়েছে আমাদের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, যার প্রার্থিত বস্তু অধিকাংশ সময়ে রয়ে গেছে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে। রবীন্দ্রনাথ এই কাঙ্ক্ষিত বস্তু সম্বন্ধে বলেন,

কোন্ অনেক দূরে উদাস সুরে
আভাস যে কার পাই রে —
আছে-আছে নাই রে।।

(পৃ. ৩৩৩)

তাই সেই বস্তু সম্বন্ধে 'আছে-আছে' বা 'নাই রে' এই দুধরনের বোধই হতে পারে। কারণ আভাসেই আমরা তাকে জানতে পারি।

মানুষের জীবনে ঈপ্সা ও এষণার সংঘাত বাধে। সে যখন মঙ্গলের বোধকে তার আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে তখন ক) তার ব্যক্তিসত্তার দুধরনের অভিব্যক্তির মধ্যে,[৪] খ) তার এষণা ও ঈপ্সার মধ্যে, গ) যে-সকল বস্তু তার ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে এবং যা পাওয়ার জন্য মানুষ তার অন্তরে সংকল্প নিয়েছে, তার মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়। যা আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক তা আমাদের মহত্তর জীবনের জন্য কাম্য। এর সঙ্গে প্রভেদ করলে দেখা যায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তিদায়ক যা-কিছু তার স্থান অনেক নীচে। তাই জীবনে সত্যের নিরীক্ষা থেকেই মঙ্গলের বোধ জাগ্রত হয় যা জীবনক্ষেত্রের পূর্ণতার সঙ্গে সম্পর্কিত। আমাদের জীবনে বর্তমানে যা রয়েছে বা যা নেই এবং যা হয়তো মানুষ কখনো অর্জন করতে পারবেই না, এ সমস্ত মঙ্গলের বোধের বিবেচনাধীন। মানুষ দূরদর্শী, সে তার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয়, তুলনামূলকভাবে সে তার আপনার জীবনের চেয়ে সেই অনাগত দিনগুলির সম্বন্ধে আরও বেশি সচেতন হয়ে ওঠে। তাই সে অনুপলব্ধ ভবিষ্যতের জন্য বর্তমান কালে যা আকর্ষণীয় তাও ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় কারণ আজ যা মানুষকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে কাল তার প্রতি সে কোনো আকর্ষণ বোধ না-ও করতে পারে বা প্রয়োজনের সম্পর্কে জড়িত হলে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাকে বর্জন করাই হয়। সমস্ত ব্যাপারটি আত্মগত (subjective) অনুভূতি থেকে ঘটে। যে সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে সে তার ক্ষণিকের

সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার কোলে।
যাক-না গো সুখ জ্বলে।।
যাক-না পায়ের তলার মাটি, তুমি তখন ধরবে আঁটি
তুলে নিয়ে দুলাবে ওই বাহুদোলার দোলে।।

(পৃ. ৯৫-৯৬)

আত্মমুখীনতার স্তর থেকে বিচার করলে সুখ ও দুঃখ তাদের গুরুত্ব নিয়ে দেখা দেয়। মানুষের মধ্যে যে দু'ধরনের 'আমি' আছে তার মধ্যে যে 'আমি' ক্ষুদ্র তার কাছে জাগতিক সুখ ও দুঃখ যথেষ্ট তাৎপর্য লাভ করে। অথচ নৈতিক স্তরে মঙ্গলের বোধের পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে সে সব দুঃখ ছোটো হয়ে দেখা দেয়। এমনভাবে দেখা দুই 'আমি'-র মধ্যে যে মহীয়ান 'আমি' তার পক্ষেই সম্ভব। আমরা যাঁদের অতিমানব আখ্যা দিই, যাঁরা জীবনে চূড়ান্ত প্রতিকূলতা সহ্য করেছেন তাঁদের মধ্যে মহীয়ান 'আমি' জাগ্রত হয়েছে।

আমরা যখন পূর্ণ মঙ্গলকে বোধ করি তখন আমরা নিজেদের পরমাত্মায় বোধ করি অর্থাৎ সেই অসীমকে নিজেদের জীবনে বোধ করি। জীবন সম্বন্ধে এ এক সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গি। জীবনকে এভাবে দেখার অর্থ হচ্ছে তাকে সামগ্রিকভাবে দেখা। এ দেখা সম্ভব হয় আমাদের অন্তর্নিহিত নৈতিক দৃষ্টির দ্বারা। আমরা যখন নিজেদের জীবনে কোনো মহৎ আদর্শের সন্ধান পাই তখন জীবনের নীতিবোধ সেই আদর্শের অনুপ্রেরণাতেই গড়ে উঠে তারই অঙ্গীভূত হয়। যা প্রকৃত মঙ্গল তা অশুভ বা পাপের অভাব নয়, মঙ্গল তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তার অলৌকিকত্ব দিয়ে পাপ অথবা মন্দের পরিবর্তন ঘটায়। সামগ্রিক জীবন বলতে যা বোঝায় তার অর্থ অনুধাবন করতে বুদ্ধের উপদেশের কথা স্মরণ করতে হয়। তাঁর মতে নৈতিকশক্তিকে তার সর্বোচ্চ স্তরে লাভ করতে হলে আমাদের কর্মের জগৎকে ব্যক্তিসত্তার সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ করা যাবে না। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া তার নিজের প্রয়োজনেই সীমিত থাকে। এই চাওয়া তাকে সর্বকালীন কোনো কিছুই দেয় না। তার ব্যক্তিগত স্বার্থ কখনোই বিশ্বগত কিছুকে লাভ করে না। জীবনকে খণ্ড করে দেখলে ব্যক্তিগত পাওয়াকেই বড়ো করে দেখা হয় কিন্তু সমগ্র জীবনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে এই পাওয়া তার

Scanned with CamScanner

গুরুত্ব হারায়। জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখে এই ব্যক্তিগত পাওয়াকে বিশ্বগত পাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারলে নীতিগতভাবেই সেই পাওয়া হয় সর্বোচ্চ পাওয়া।

যিশুখ্রিস্টের স্বর্গরাজ্যের চিত্রকল্পটিও একই ধরনের, আমরা যখন সেই সর্বজনীন জীবন বা নৈতিক জীবনে উপনীত হই তখন সেখানে আমরা সুখ ও দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হই যা আমাদের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। এ অবস্থায় আত্মার কর্মও বহুগুণে বর্ধিত হয় কারণ কামনা বাসনা তাদের উৎস নয়— এদের উৎস হচ্ছে তার অপরিসীম আনন্দ যা উঠে আসে সীমাহীন প্রেম থেকে। রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের কর্মকে গীতার কর্মযোগে বর্ণিত নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নিঃস্বার্থভাবে মঙ্গলকর্ম অভ্যাস করলে সেই অসীম কর্মের সঙ্গে এক হওয়া যায়। কর্ম নিষ্কাম হলে তার থেকে সুখ বা দুঃখ উৎপন্ন হয় না।

বুদ্ধ যখন মানুষের দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় সম্বন্ধে ধ্যান করেছিলেন তখন তাঁর কাছে এই সত্য উপলব্ধ হয় যে মানুষের ব্যক্তিসত্তা যখন সর্বব্যাপী সত্তাতে মিশে যায় তখন সে দুঃখের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের এক ছাত্র তাঁর কাছে অভিযোগ করে যে একদিন ঝড়ের মুখে পড়ে তার অবস্থা একমুঠো ধূলির মতো হয়েছিল। সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে তার ব্যক্তিত্ব ও নিজস্ব ইচ্ছা কিছুই কাজ করেনি অর্থাৎ তার ইচ্ছা ঘটনাটিকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে বলেন, যদি আমাদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য প্রকৃতিকে কক্ষচ্যুত করতে পারত তবে ব্যক্তির-ই ক্ষতি হত। প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে বলেই মানুষ সুরক্ষিত আছে।

ছাত্রটির সংশয় তবু দূর হল না। তার মনে যে বিপন্নতা জেগেছে তা খুবই স্বাভাবিক। যখনই আমরা প্রকৃতির নিয়মে চালিত হই তখনই নিজেকে প্রকৃতির হাতের পুতুল বলে মনে হয়। মনে করি আমার সব অনন্যতা ও বৈশিষ্ট্য হারালাম। অথচ আমি আমার অনন্যতা হারাতে চাই না। সর্বদাই আমার একটা বোধ হয় যে 'আমি আছি', 'I am'। ছাত্রটিও তার 'আমি আছি' বোধটিকে প্রাধান্য দিতে চাইল কারণ মানুষের নিজের মধ্যে যে 'আমি' সে এক সম্পর্ক স্থাপন করতে

Scanned with CamScanner

উৎসুক যা তার কাছে একটি বিশেষ সম্পর্ক হয়ে ওঠে। একক আমি তার অনন্যতা বজায় রেখে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। এই বিশ্বাসের জায়গা থেকে ছাত্রটি তার সংশয় প্রকাশ করছে কী করে প্রকৃতির লীলায় তার আমিত্ব লোপ পেলে তার সেটা কাম্য মনে হবে।

রবীন্দ্রদর্শনে আমরা পাই 'আমি' যখন সম্পর্ক গড়ে তখন তা 'না-আমি'-কেই বেছে নেয়। বাইরের যে বহু তা হচ্ছে 'না-আমি'। এই 'না-আমি'কে যখন মানুষ নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে তখন সে নিজেকেই পেতে চায়। তার চৈতন্যে যে বহুর বোধ তা 'আমি আছি' এই বোধকেই স্পষ্ট করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি আছি' এবং 'না আমি' আছে, এই দুই নিরন্তর ধারা আমার মধ্যে ক্রমাগতই একীভূত হয়ে আমাকে সৃষ্টি করে চলেছে.......'। ("সাহিত্যতত্ত্ব", 'সাহিত্যের পথে', র-র ১৪, পৃ. ৩৫৩)।

'আমি' ও 'না-আমি'-র মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হয় তা মানুষের নিজের অন্তরেই একটা পরিবর্তন আনে। গভীর অনুভূতি হলে মানুষের পরিশুদ্ধ অন্তরে যে কল্পনাশক্তি জাগে তার সাহায্যে 'অন্য-কিছুর অনুসারে' সে হয়ে ওঠে। 'বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে' যাওয়া সম্ভব হয় অন্তরে যে সামঞ্জস্যবোধ আছে তার সহায়তায়। 'আমি' এবং 'না-আমি' সম্পর্কিত হতে পারে কিন্তু দু'পক্ষকেই এমন একটি মাধ্যম খুঁজে নিতে হবে যা দু'জনের মধ্যেই বর্তমান এবং এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে তা 'আমি' এবং 'না-আমি'-র মধ্যে একইভাবে রয়েছে।

মানুষের একের বোধ

মানুষ যখন 'আমি আছি' সত্যটিকে জানে তখন সে যে এক এ কথা সে বোঝে। তার বাইরে যা-কিছু রয়েছে তারা সংখ্যায় বহু। এই এক ও বহুর মধ্যেই মিলন ঘটে। এই মিলনের প্রয়োজন আছে কারণ বাইরের আর সমস্তকে যদি অনুভব করা না যায় তা হলে নিজেকে অনুভব করা যাবে না।

মানুষ বোঝে তার টিকে থাকা নির্ভর করছে অন্যের টিকে থাকার মধ্যে এবং তাই সে নিজের মধ্যে অনন্তের পরিচয় বহন করে। 'আমি আছি এবং অন্য

জ্বলে উঠুক সকল হুতাশ, গর্জি উঠুক সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ পূর্ণতা বিস্তারো।।

(পৃ. ৯৮-৯৯)

'সাধনা' গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ যে মায়ের কথা বলেন তিনি তাঁর চরম দুরবস্থার মধ্যেও সন্তানকে কাছে রেখে প্রতিপালন করতে চান। সন্তানকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে তাঁর কষ্ট লাঘব করার প্রস্তাবে তিনি আঘাত পান। এ কষ্ট তিনি সহ্য করতে চান কারণ এ তাঁর ভালোবাসার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মানুষের নানা সমস্যাকে কেন্দ্র করেই তার মুক্তিলাভ ঘটে, তার সমস্যাকে সে আপন মঙ্গলের জন্যই গ্রহণ করে, তা তার আনন্দলাভের উপকরণ হয়ে ওঠে। যখন আমাদের এই উপলব্ধি ঘটে যে ব্যক্তিসত্তা আমাদের কাছে চরম তাৎপর্য বহন করে না তখন আমরা এভাবেই চিন্তা করতে সক্ষম হই যে আমাদের মধ্যে যিনি বিশ্বমানব তিনি অমর। কারণ তিনি মৃত্যু যন্ত্রণাকে ভয় পান না এবং দুঃখ বা বেদনাকে আনন্দের অপর পিঠ বলে মনে করেন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর "দুঃখ" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বলেন — 'দুঃখ এবং আঘাত ন্যায্য হোক বা অন্যায্য হোক তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে নিঃশেষে বাঁচিয়ে তোলার অতিচেষ্টায় আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্বল ও ব্যধিগ্রস্ত করে তোলে।' (র-র ১২, পৃ. ১০৭)। অসম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে আমরা যে দুঃখ পাই তা আমাদের পরম সম্পদ এবং এই দুঃখবোধের মধ্য দিয়ে আমরা মহৎ হয়ে উঠে সেই পূর্ণ মানবের সঙ্গে একাত্ম হই। কবিকণ্ঠে তাই এ সংগীত শুনি—

পুষ্প দিয়ে মারো যারে চিনল না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে ধরে তোমার চরণকে।।

(পৃ. ২৩২)

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনে দুঃখের অনিষ্টকর দিকটির কথাও বলেছেন। দুঃখকে মানুষ যখন তার আত্মরতির জন্য আহ্বান জানায় তখনই দুঃখ ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। দুঃখকে এভাবে ব্যবহার করা হলে তা দুঃখের অবমাননা। মানুষের মধ্যে যদি দুঃখ ভোগ করা নিয়ে কোনো অহমিকা জন্মায় তখনই তা যন্ত্রণার কারণ হয়। দুঃখ নিয়ে কোনোরকম

Scanned with CamScanner

আতিশয্য মানুষের চিত্তশুদ্ধি ঘটায় না, সে তখন মানসিক অবসাদে ভোগে। দুঃখকে অসীমের সঙ্গে যুক্ত করে যখন দেখা হয় তখনই তার পরম আনন্দময় রূপে প্রকাশ হয়।

তথ্যসূত্র

১. 'বসুন্ধরা' কবিতায় ও অন্য লেখায় বৃহৎ ধরণীর প্রতি যে নাড়ির টানের উল্লেখ রয়েছে সে সম্পর্কে ছিন্নপত্র গ্রন্থের ৭৪-সংখ্যক পত্রে (৫ ভাদ্র ১২৯৯, আর 'বসুন্ধরা'-র রচনাকাল : ২৬ কার্তিক ১৩০০) লেখা হয়েছে — 'এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম—তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। ....শিলাইদহ। ২০ অগস্ট ১৮৯২ ('সঞ্চয়িতা', পুনর্মুদ্রিত আশ্বিন ১৩৭৩, গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৮৪৮)

২. আবু সয়ীদ আইয়ুবের কাছে 'উৎসর্গ' (১৩১০) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত 'মরণমিলন' (বঙ্গদর্শন· ১৩০১, ভাদ্র) কবিতাটি 'হালকা ঠেকে' এবং তিনি বলতে চান রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের তুলনায় 'পূর্ববর্তী মৃত্যুরাগকে পলায়নী ভাবাবেশ এমন কি ভাবালুতা......'। 'বলাকা' (১৩২১-২২) কাব্যগ্রন্থে 'ভিন্ন সুর দেখা যায়' যেখানে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনো মিতালি নেই, 'আছে মৌলিক বৈরিতা।' ('পান্থজনের সখা', পৃ. ৭৫) 'উৎসর্গ' লেখার বহু বছর পরে 'পরিশেষ' (১৩৩৭-৩৯)-এর 'মৃত্যুঞ্জয়' (১৭ আষাঢ় ১৩৩৯) কবিতায় মৃত্যু-আঘাত পাবার আগে কবি মৃত্যুকে ভয় পান —
'ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরুদুরু বুকে / তোমার সম্মুখে।' (র-র ২, পৃ. ৯৩৭) কিন্তু মৃত্যু-আঘাত পেয়ে 'ভেঙে গেল ভয়' এবং আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু কবির কাছে অনেক ছোটো হয়ে গেল এবং তাঁর মনে হল —'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো'। কবি মৃত্যু-আঘাত পেয়ে মৃত্যুকে জয় করেন।
এই কবিতাটি রচিত হয় কবি-দৌহিত্র নীতুর জার্মানিতে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর। যদিও রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত শোক দুঃখ সেভাবে প্রকাশ করতেন না তবু কাব্যের মধ্যে তা প্রচ্ছন্ন থাকেনি। (দ্রষ্টব্য : 'রবীন্দ্রজীবনী' ৩, পৃ. ৪৭৮)। তবে এই গানের বাণীতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুতেও ঈশ্বরের 'পরশ' অনুভব করেছেন —

'সহসা দারুণ দুখতাপে সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন সকল বাঁধন যবে ছিন্ন
মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে —
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।।' (পৃ. ২২৫)

Scanned with CamScanner